ইউনিট ২
গৃহপালিত পশুর
ভাইরাসজনিত
সংক্রামক রোগ

ইউনিট ২ গৃহপালিত পশুর ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ

মানুষের ন্যায় গৃহপালিত পশুও বিভিন্ন রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। কিন্তু পশুর রোগব্যাধির প্রতি আমরা প্রায়ই গুরুত্ব দিই না। অথচ এসব প্রাণীতে রোগব্যাধির গতিপ্রকৃতি অত্যন্ত জটিল। আমাদের পরিবেশে রোগ সৃষ্টির উপাদানসমূহ সর্বদা বিদ্যমান। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, মাইকোপ্লাজমা, রিকেটেশিয়া, ছত্রাক প্রভৃতি রোগজীবাণু এবং বিভিন্ন পরজীবী অহরহ মানুষ ও পশুপাখির সংস্পর্শে আসছে। রোগ সৃষ্টির এসব জীবাণু সাধারণত খালি চোখে দেখা যায় না। তাই মানুষ ও গৃহপালিত পশুপাখি সুস্থ রাখার জন্য পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যপোযোগী রাখা অপরিহার্য। উপরোল্লিখিত জীবাণুজনিত, বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস সংক্রমিত রোগ মহামারী হিসেবে দেখা দেয় এবং এতে অল্প সময়ে অসংখ্য পশুপাখি মারা যেতে পারে। ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট রোগ অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগের মাধ্যমে নিরাময় করা যায়। কিন্তু ভাইরাস সংক্রমিত রোগের জন্য অদ্যাবধি কোনো চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয় নি। এসব রোগের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, রোগ সৃষ্টির আদর্শ পরিবেশ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকলে রোগের প্রাদুর্ভাব কমানো যেতে পারে। গৃহপালিত পশুতে ভাইরাসজনিত রোগ অতি দ্রুত সংক্রমিত ও সম্প্রসারিত হয়।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে গৃহপালিত পশুর ক্ষুরারোগ, বসন্ত ও জলাতঙ্ক রোগের কারণ, লক্ষণ, রোগ নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ২.১ ক্ষুরারোগ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ক্ষুরারোগ কী তা বলতে পারবেন এবং এ রোগের কারণ লিখতে পারবেন।
- ক্ষুরারোগ কীভাবে পশুতে সংক্রমিত হয় এবং বিকাশ লাভ করে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ক্ষুরারোগের লক্ষণ, রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- ক্ষুরারোগের ক্ষতিকর প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

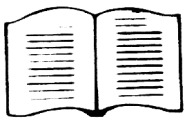

ক্ষুরারোগ সকল বিভক্ত ক্ষুরবিশিষ্ট প্রাণীতে দেখা যায়।

ক্ষুরারোগ কি?

ক্ষুরারোগ একটি অতিতীব্র প্রকৃতির সংক্রামক ভাইরাসজনিত রোগ। এ রোগ সকল বিভক্ত ক্ষুরবিশিষ্ট (Cloven Footed) প্রাণীতে দেখা যায়। এ রোগে আক্রান্ত পশুর মুখ ও পায়ে ঘা হবার ফলে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না এবং খুঁড়িয়ে হাঁটে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এ রোগ দেখা যায়। তবে, বাংলাদেশের গর€তে ক্ষুরারোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশি।

ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিজ নামক এক প্রকার ভাইরাস ক্ষুরারোগের কারণ।

রোগের কারণ

ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিজ (Foot and Mouth Disease) নামক এক প্রকার ভাইরাস এ রোগ সৃষ্টি করে। সে কারণে ইংরেজিতে ক্ষুরারোগকে এফ.এম.ডি. (FMD) বলে। এ ভাইরাসের মোট ৭টি টাইপ রয়েছে। এগুলোর নাম এ (A), ও (O), সি (C), স্যাট-১ (SAT-1), স্যাট-২ (SAT-2), স্যাট-৩ (SAT-3) ও এশিয়া-১ (ASIA-1)। বাংলাদেশে ও এবং এশিয়া-১ টাইপের ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি।

আক্রান্ত পশুর দুধ, মল, প্রস্রাব, বীর্য প্রভৃতির মাধ্যমে ভাইরাস পরিবেশে প্রত্যাগমন

রোগ সংক্রমণ

ক্ষুরারোগ অত্যন্ত সংক্রামক হওয়ায় কোনো এলাকায় এ রোগ দেখা দিলে একশত ভাগ পশুই তাতে আক্রান্ত হয়। রোগাক্রান্ত পশুর মধ্যে শতকরা ২ ভাগ বয়স্ক ও ২০ ভাগ বাচ্চা মারা যায়। তবে, তীব্ররূপে রোগ দেখা দিলে শতকরা ৫০ ভাগ পশুও মারা যেতে পারে।

গরুতে এ রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশি। তবে ছাগল, ভেড়া, শূকর প্রভৃতি পশুতেও এ রোগ দেখা যায়। আক্রান্ত ছাগল ও ভেড়া থেকে সহজেই এ রোগ গরুতে সংক্রমিত হতে পারে। নিরাময়প্রাপ্ত গরু ১–৪ বৎসর পর্যন্ত এ রোগের পুনরাক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। কম বয়স্ক সকল পশুতে এ রোগের প্রকোপ সর্বাধিক।

ক্ষুরারোগের জীবাণু খাদ্য ও শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে এ রোগের জীবাণু সক্রিয় অবস্থায় ৫০ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত চলে যেতে পারে। সংক্রমণের পরপরই জীবাণু রক্ত প্রবাহ, দুধ এবং লালার মধ্যে প্রবেশ করে। সংক্রমিত পশুর দুধ, মল, প্রস্রাব, বীর্য প্রভৃতির মাধ্যমে ভাইরাস আবার পরিবেশে ফিরে আসে। আক্রান্ত পশুর শতকরা ৫০ ভাগ রোগ নিরাময়ের পর শরীরে ভাইরাস বহন করে। এসব পশু থেকেও সুস্থ পশুতে রোগের বিস্তার ঘটতে পারে। ক্ষুরারোগের ভাইরাস বীর্যের মধ্যে প্রবেশ করার কারণে ভাইরাস বহনকারী ষাঁড় কৃত্রিম প্রজননের জন্য অত্যন্ত বিপদজনক। কারণ, এসব ষাঁড় থেকে সংগৃহীত বীর্য কৃত্রিম প্রজননে ব্যবহার করলে এ রোগ মহামারী আকারে দেখা দিতে পারে।

রোগের বিকাশ

ক্ষুরারোগের ভাইরাস শরীরে অনুপ্রবেশ করার পর যথপোযুক্ত জায়গাসম হ অর্থাৎ মুখগহ্বর ও জিহ্বার বহিরাবরণী, বিভক্ত ক্ষুরের মধ্যবর্তী স্থান, ওলান ও ওলানের বাটে সম্প্রসারিত হয়। পরে এসব স্থানে রোগের চিহ্ন দেখা দেয়। সংক্রমণের ১–৮ দিনের মধ্যে এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আক্রান্ত পশুর শতকরা ৭৫ ভাগের মুখে এবং ২৫ ভাগের ক্ষুরে এ রোগের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। ক্ষুরারোগ সব ঋতুতেই দেখা যায়। তবে, বর্ষার শেষে এবং শরৎকালে এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়।

ক খ

চিত্র ২৫ (ক, খ) ঃ ক্ষুরারোগে আক্রান্ত গরুতে রোগলক্ষণ
ক– মুখ দিয়ে অতিরিক্ত লালা নির্গমন ও খ– ফোস্কা ফেটে গিয়ে জিহ্বায় ক্ষত

রোগের লক্ষণ

ক্ষুরারোগের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণসমূহ নিম্নরূপ–

- আক্রান্ত পশুর শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং তা সাধারণত ৪০°–৪১.১° সে. (১০৪°–১০৬° ফা.) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।
- মুখে ক্ষত থাকার কারণে পশু খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। ফলে ক্ষুধামন্দা দেখা দেয় এবং মুখে তীব্র বেদনাযুক্ত প্রদাহ শুরু হয়।
- মুখ থেকে অতিরিক্ত লালা নির্গমণ ঘটে এবং তা প্রায়শ সুতাকৃতি অবস্থায় ঝুলতে থাকে।
- পরবর্তীতে মুখ ও জিহ্বায় ফোস্কা দেখা দেয়। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এসব ফোস্কা ফেটে বেদনাযুক্ত কাঁচা ঘায়ে পরিণত হয়। এ কারণে পশু খেতে পারে না। এসব ঘা শুকাতে প্রায় এক সপ্তাহ সময় লাগে।
- একই সময় এ রোগের লক্ষণ দুই ক্ষুরের মধ্যবর্তী স্থান (Cleft) এবং ক্ষুর-ত্বকের সন্ধিস্থলে (Coronet) দেখা যায়। ক্ষতস্থানে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের ফলে আরও জটিল হয়। ফলে আক্রান্ত পশু খুঁড়িয়ে হাঁটে। এ পর্যায়ে পায়ের নিচের অংশ ফুলে যায় এবং উক্ত স্থান গরম ও বেদনাদায়ক হয়।
- খাদ্য গ্রহণে অনিহা ও অক্ষমতার কারণে আক্রান্ত পশুর দৈহিক ওজন দ্রুত হ্রাস পায়। এ রোগ থেকে সেড়ে ওঠতে অন্তত ৬ মাস সময় লাগে।
- আক্রান্ত পশু দুগ্ধবতী হলে দুধের পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পায়।
- অল্পবয়স্ক পশুতে এ রোগের তীব্রতা বয়স্ক পশুর চেয়ে অনেক বেশি।
- এ রোগের প্রভাবে নিরাময়প্রাপ্ত পশুর শ্বাসকষ্ট, রক্তশ ন্যতা এবং পরিবেশগত উচ্চ তাপমাত্রায় অসহিষ্ণুতা পরিলক্ষিত হয়।

ক্ষুরারোগ হলে পশুর শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। মুখ ও পায়ে ঘা হয়। খাদ্য গ্রহণে অনিহা ও মুখ থেকে সুতাকৃতির লালা নির্গত হয়। বাছুরে এ রোগের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত বেশি।

রোগ নির্ণয়

আক্রান্ত পশুতে রোগের লক্ষণ ও উপসর্গসমূহ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুরারোগ নির্ণয় করা যায়। এসব লক্ষণ ও উপসর্গসমূহের মধ্যে অতিরিক্ত দৈহিক তাপমাত্রা, মুখগহ্বর ও দুই ক্ষুরের সংযোগস্থলে প্রথমে ফোস্কা এবং পরে ঘা, খোঁড়ানো এবং মুখ থেকে লালা পড়া উল্লেখযোগ্য। গরুর ভেসিকুলার স্টোমাটাইটিস (Vesicular Stomatitis) রোগেও ক্ষুরারোগের ন্যায় মুখে ও পায়ে ফোস্কা দেখা দেয়। তবে, আমাদের দেশে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বিরল।

আক্রান্ত পশুতে রোগের লক্ষণ ও উপসর্গ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুরারোগ নির্ণয় করা যায়।

চূড়ান্ত রোগ নির্ণয়ের জন্য গবেষণাগারে কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন টেস্ট (Complement Fixation Test) করা হয়। এছাড়া আক্রান্ত পশুর ক্ষত থেকে সংগৃহীত নমুনা গিনিপিগে অনুপ্রবেশ করানো হলে যদি ৭–৮ দিনের মধ্যে অনুপ্রবেশ স্থান ও মুখে ফোস্কা দেখা দেয় তাহলে ক্ষুরারোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

চিকিৎসা

ভাইরাসজনিত রোগ বলে ক্ষুরারোগের কোনো কার্যকর চিকিৎসা নেই। তবে, ক্ষতস্থানসমূহ ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য স্থানীয়ভাবে জীবাণুনাশক এবং সাধারণভাবে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যেতে পারে। পায়ের ক্ষতস্থানে সালফানিলামাইড পাউডার ব্যবহার করা যেতে পারে।

ভাইরাসজনিত রোগ বলে ক্ষুরারোগের কোনো কার্যকর চিকিৎসা নেই।

আক্রান্ত পশুকে পরিষ্কার ও শুকনো স্থানে রাখতে হবে, তরল খাবার দিতে হবে এবং প্রয়োজন হলে নলের সাহায্যে খাওয়াতে হবে।

জটিলতা

ক্ষুরারোগে আক্রান্ত পশুতে গর্ভপাত, ওলানপ্রদাহ, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগ হতে পারে।

রোগ নিয়ন্ত্রণ

পৃথিবীর অনেক দেশ, যেমন– ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ক্ষুরারোগমুক্ত।

- পৃথিবীর অনেক দেশ ক্ষুরারোগমুক্ত। এসব দেশের মধ্যে ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড উল্লেখযোগ্য। এসব দেশে হঠাৎ কোনো স্থানে ক্ষুরারোগ দেখা দিলে আক্রান্ত পশুকে মেরে মাটির নিচে পুতে রাখা হয়। আমাদের দেশে এ রোগের প্রাদুর্ভাব ব্যাপক বলে অনুরূপ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা সম্ভব নয়।
- রাসায়নিক বিক্রিয়ার তারতম্য, সূর্যরশ্মি ও তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে সহজেই এ ভাইরাস নিষ্ক্রিয় হয়।
- গবাদিপশুর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কারণ, আক্রান্ত পশু একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলাচলের ফলে রোগ বিস্তারলাভ করে।
- সঙ্গনিরোধ বা কোয়ারেন্টাইন (Quarantine) ব্যবস্থা যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এ ব্যবস্থা ছাড়াই সীমান্তবর্তী দেশ ভারত থেকে প্রতিদিন অসংখ্য গরু বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করায় এ রোগ নিয়ন্ত্রণ দুরূহ হয়ে পড়েছে।
- আক্রান্ত পশুকে সুস্থ পশু থেকে আলাদা করে রাখতে হবে যেন সুস্থ পশুতে এ রোগের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- আক্রান্ত পশুর আবাসস্থল (গোয়াল ঘর) ২% সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড অথবা ৪% সোডিয়াম কার্বনেট দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে।
- এ রোগে মৃত পশুকে মাটির নিচে পুতে রাখতে হবে। কারণ, মৃতদেহ মুক্তস্থানে ফেলে রাখলে এ রোগের ভাইরাস সহজেই অন্যান্য পশুতে সংক্রমিত হয়। টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে গবাদি পশুকে ক্ষুরারোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যায়। এ রোগের টিকা নির্ধারিত মাত্রায় পশুর গলকম্বলের ত্বকের নিচে ইনজেকশন আকারে দেয়া হয়। টিকাপ্রাপ্ত পশু ৪–৬ মাস পর্যন্ত ক্ষুরারোগ প্রতিরোধ করতে পারে, অর্থাৎ প্রতি ৬ মাস অন্তর এ রোগের টিকা প্রদান করতে হবে। চার মাসের কম বয়সের পশুকে এ টিকা দেয়া হয় না। গর্ভবতী গাভীকে ক্ষুরারোগের টিকা দেয়া যায়।

প্রতি দুই মাস অন্তর ক্ষুরারোগের টিকা নির্ধারিত মাত্রায় পশুর গলকম্বলের ত্বকের নিচে ইনজেকশন আকারে দেয়া হয়।

ক্ষতিকর প্রভাব

ক্ষুরারোগ থেকে সেড়ে উঠা পশুর উৎপাদন ক্ষমতা, গর্ভধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি কমে যায়।

- ক্ষুরারোগের প্রাদুর্ভাব বাংলাদেশে ব্যাপক। প্রতি বছর অসংখ্য পশু এ রোগে আক্রান্ত হয়। এদের মধ্যে অনেক পশু, বিশেষ করে বাছুর, মারা যায়।
- এ রোগের কারণে দীর্ঘদিন পশুকে কৃষিকাজে ব্যবহার করা যায় না। ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়।
- দৈহিক ওজন হ্রাস পাওয়ায় মাংসের উৎপাদন কমে যায়। দুগ্ধবতী গাভীর দুধ কমে যায়। কাজেই এ রোগের কারণে প্রথম পর্যায়ে কৃষক এবং পরবর্তীতে জাতীয় অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়ে।
- এ রোগের কারণে পশুর গর্ভধারণ ক্ষমতা লোপ পেতে পারে, এমনকী গর্ভপাত হতে পারে যা কৃষকের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

অনুশীলন (Activity) ঃ *গরুতে ক্ষুরারোগের লক্ষণ ও ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে লিখুন।*

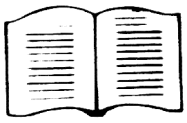

সারমর্ম ঃ ক্ষুরারোগ একটি অতি তীব্র প্রকৃতির সংক্রামক ভাইরাসজনিত রোগ। এ রোগ সকল বিভক্ত ক্ষুরবিশিষ্ট পশুতে দেখা যায়। আক্রান্ত পশুর মুখ ও পায়ে ঘা হয় এবং মুখ থেকে সুতাকৃতির লালা নির্গত হয়। দৈহিক তাপমাত্রা ৪০.০°–৪১.১° সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এ রোগে পশু খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না এবং খুঁড়িয়ে হাঁটে। বয়স্ক পশু অপেক্ষা বাছুরে এ রোগের মৃত্যুর হার বেশি। রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস প্রধানত খাদ্য ও শ্বাসনালির মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। আক্রান্ত পশুর লক্ষণ দেখে এ রোগ নির্ণয় করা যায়। তবে চুড়ান্ত রোগ নির্ণয়ের জন্য গবেষণাগারে নমুনা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। ক্ষুরারোগের কোনো কার্যকর চিকিৎসা নেই। তবে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমিত জটিলতা প্রতিরোধের জন্য মুখ ও পায়ের ক্ষতস্থানে জীবাণুনাশক প্রয়োগ ও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যেতে পারে। টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষুরারোগ প্রতিরোধ করা যায়। ক্ষুরারোগগ্রস্থ পশুর দৈহিক ওজন ও দুধ উৎপাদন কমে যায়। এছাড়া কর্মক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার কারণে কৃষি উৎপাদন ব্যহত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.১

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. ক্ষুরারোগ কী জাতীয় জীবাণু দ্বারা সৃষ্টি হয়?

i) ব্যাকটেরিয়া
ii) ভাইরাস
iii) মাইকোপ্লাজমা
iv) রিকেটশিয়া

খ. ক্ষুরারোগের ক্ষত চিহ্ন কোথায় দেখা যায়?

i) গলকম্বল ও বুকে
ii) ঘাড় ও পিঠে
iii) মুখ ও পায়ে
iv) শিং ও কানে

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. ক্ষুরারোগে বাছুর বেশি মারা যায়।
খ. কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ক্ষুরারোগ মহামারী আকার ধারণ করে।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. ক্ষুরারোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর নাম থথথথ এন্ড মাউথ ডিজিজ ভাইরাস।
খ. থথথথথ মাসের কম বয়স্ক পশুতে ক্ষুরারোগের টিকা দেয়া হয় না।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. ক্ষুরারোগের লক্ষণ পায়ের কোন্ অংশে দেখা যায়?
খ. ক্ষুরারোগের টিকা পশুর শরীরের কোন্ স্থানে দেয়া হয়?

পাঠ ২.২ গবাদিপশুর বসন্ত

এ পাঠ শেষে আপনি –

- গবাদিপশুর বসন্ত কী এবং কী কারণে এ রোগ হয় তা বলতে পারবেন।
- এ রোগ কীভাবে সংক্রমিত এবং বিকশিত হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বসন্তের লক্ষণ, রোগ নিরূপন, চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আলোচনা করতে পারবেন।
- এ রোগের ক্ষতিকর প্রভাবসম হ লিখতে পারবেন।

গর€ ও মহিষের বসন্ত রোগ (Cow and Buffalo Pox)

গর€ ও মহিষের বসন্ত মৃদু অনিষ্টকারী ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ। এ রোগে আক্রান্ত পশুর ওলান এবং বাটে বসন্তের গুটি দেখা যায়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এ রোগের উপস্থিতি রয়েছে। তবে, উন্নত দেশসমূহে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বিরল। আমাদের উপমহাদেশে, বিশেষ করে বাংলাদেশ ও ভারতে, এ বসন্তের প্রকোপ বেশি এবং অনেক সময় এ রোগ মহামারী আকারে দেখা দেয়।

গর€ ও মহিষের বসন্ত মৃদু অনিষ্টকারী ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ। এ রোগে আক্রান্ত পশুর ওলান এবং

রোগের কারণ

গরুর বসন্ত ভাইরাস (Cow Pox Virus) এবং মহিষের বসন্ ভাইরাস (Buffalo Pox Virus) সংক্রমণে যথাক্রমে গরু ও মহিষে এ রোগ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া ঘোড়ার বসন্ত ভাইরাস (Horse Pox Virus) ও গুটি বসন্ত ভাইরাস (Small Pox Virus) গরুমহিষে সংক্রমিত হলেও বসন্ত সদৃশ্য রোগ সৃষ্টি হতে পারে।

সংক্রমণ

সরাসরি সংস্পর্শ, দোহনকারী ও দোহনযন্ত্রের মাধ্যমে বসন্ত ছড়ায়।

- গরু ও মহিষের বসন্ত মৃদু প্রকৃতির ছোঁয়াচে রোগ। এ রোগ প্রধানত দুগ্ধবতী গাভীতে হয়ে থাকে। দুগ্ধ খামারের কোনো গাভীতে এ রোগ দেখা দিলে অল্প সময়ের মধ্যেই তা খামারের সকল গাভীতে সংক্রমিত হয়।
- আক্রান্ত দুগ্ধবতী গাভী দোহনের পর দুধ দোহনকারীর হাতের মাধ্যমে এ রোগ সুস্থ গাভীতে সংক্রমিত হয়। দোহন যন্ত্রের মাধ্যমেও এ রোগ অতি দ্রুত বিস্তারলাভ করে।
- ঘোড়ার বসন্তের ভাইরাস গবাদিপশুতে সংক্রমিত হলে গরু ও মহিষের বসন্তের ন্যায় রোগ দেখা দিতে পারে।
- গুটি বসন্তের টিকা গ্রহণকারী ব্যক্তি দুধ দোহন করলে তার মাধ্যমে গাভীতে এ রোগ সংক্রমিত হতে পারে।
- দুধের বাটে কোনোরূপ ক্ষত থাকলে গরু ও মহিষের বসন্তের ভাইরাস দেহে প্রবেশ করতে পারে।

রোগের বিকাশ

গরু ও মহিষের বসন্তের ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করার পর ৩–৭ দিন পর্যন্ত

গরু ও মহিষের বসন্তের ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করার পর ৩–৭ দিন পর্যন্ত সুপ্তাবস্তায় থাকে। অতঃপর শরীরে মৃদু জ্বর ও ক্ষুধামন্দা দেখা দিতে পারে। বাট এবং বাটসংলগ্ন ওলানে লাল দাগ বা ফুসকুড়ি উঠে এবং এগুলো ৭ দিনের মধ্যে ফোস্কাতে পরিণত হয়। এ ফোস্কার মধ্যে লাল, নীল বা হলদে বাদামি রঙের রস জমা থাকে। ফোস্কার এ রস ক্রমান্বয়ে পুঁজে পরিণত হয়। এ পর্যায়ে ফোস্কার

কেন্দ্র নিচু এবং এর চারপাশ উঁচু থাকে। অতঃপর ফোস্কার উপর শক্ত আবরণ পড়ে। এ আবরণ ১৫ দিনের মধ্যে খসে পড়ে এবং আক্রান্ত পশু ক্রমান্বয়ে আরোগ্য লাভ করে।

রোগের লক্ষণ

- বসন্ত প্রধানত দুগ্ধবতী গাভীতে দেখা যায়। আক্রান্ত গাভীর ওলান ও বাটে বসন্তের গুটি দেখা দেয়। তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে এসব গুটি উরু, মলদ্বার এবং যোনিমুখের চারপাশে বিস্তৃত হতে পারে। এসব গাভী থেকে দুধ গ্রহণকারী বাছুরের মুখের চারপাশে এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। ষাঁড়ে কখনও বসন্ত দেখা দিলে অন্ডকোষের ত্বকে সীমাবদ্ধ থাকে।
- আক্রান্ত গাভীর বাট ও ওলানে হলুদাভ বাদামি অথবা লাল রঙের অনধিক দুই সেন্টিমিটার ব্যাসবিশিষ্ট মামড়ি দেখা দেয়। সাধারণত ২ সপ্তাহের মধ্যে এসব চিহ্ন বিলুপ্ত হয় এবং পশু আরোগ্য লাভ করে। তবে কখনও কখনও এ রোগ থেকে পরিত্রাণ পেতে মাসাধিককাল সময় লাগে।
- বাটে ব্যাথা অনুভূত হওয়ায় গাভী দুধ দোহনে বাধা দেয়।
- বসন্তের ফলে গাভীর ওলানপ্রদাহ দেখা দিতে পারে।
- আক্রান্ত গাভীতে দুধ দোহনের কারণে দোহনকারীর হাতে, বাহুতে এবং মুখমন্ডলে এ রোগের লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

রোগ নির্ণয়

রোগের লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে গরু ও মহিষের বসন্ত সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

রোগের লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে গরু ও মহিষের বসন্ত সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যেতে পারে। তবে সিউডোকাউ পক্স (Pseudocow Pox), বোভাইন আলসারেটিভ মেমিলাইটিস (Bovine Ulcerative Mammilitis), পেপিলোমা (Papilloma) প্রভৃতি রোগে বসন্ত সদৃশ্য লক্ষণ দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত পশুর বাট ও ওলানের ক্ষতস্থান থেকে সংগৃহীত নমুনা গবেষণাগারে পরীক্ষা করে এ বসন্তের ভাইরাস চিহ্নিত করা যায়। এ রোগের ভাইরাস মুরগির ভ্রূণে বংশবৃদ্ধি করলে গাঢ় লাল রঙের 'পক লিশন (Pock lesion)' তৈরি করে।

চিকিৎসা

ভাইরাসজনিত রোগ হওয়ায় গরু ও মহিষের বসন্তের কোনো কার্যকর চিকিৎসা নেই।

ভাইরাসজনিত রোগ হওয়ায় গরু ও মহিষের বসন্তের কোনো কার্যকর চিকিৎসা নেই। তবে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের মাধ্যমে জটিলতা সৃষ্টি রোধকল্পে স্থানীয়ভাবে জীবাণুনাশক এবং সাধারণভাবে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যেতে পারে। দোহনের প র্বে ১০% সালফাথায়াজল মলম অথবা ৫% সালফাথায়াজল ও ৫% স্যালিসাইলিক অ্যাসিডের সংমিশ্রণে প্রস্তুত মলম বাটে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

রোগ নিয়ন্ত্রণ

গরু ও মহিষের বসন্ত নিয়ন্ত্রণ করা বেশ কষ্টসাধ্য। গরু ও মহিষের বসন্তর বিরুদ্ধে কোনো ফলপ্রসু টিকা নেই।

গরু ও মহিষের বসন্ত নিয়ন্ত্রণ করা বেশ কষ্টসাধ্য। দোহনকারীর হাত ও কাপড়চোপড় দোহনের পরপরই জীবাণুনাশক দ্বারা যথাযথভাবে পরিষ্কার করতে হবে। দোহন যন্ত্রের যে অংশ বাটে লাগানো হয় (Teat Cup) সেটিও অনুরূপভাবে পরিষ্কার করতে হবে। উল্লেখ্য, গরু ও মহিষের বসন্তের বিরুদ্ধে কোনো ফলপ্রসু টিকা নেই। তবে আক্রান্ত পশু পরবর্তী কয়েক বছরের জন্য রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়।

ক্ষতিকর প্রভাব

গরু ও মহিষের বসন্ত একটি কম ক্ষতিকর ভাইরাজনিত রোগ। এর জটিলতা হিসেবে ওলানপ্রদাহ দেখা দিতে পারে।

প্রথমেই বলা হয়েছে, গরু ও মহিষের বসন্ত একটি কম ক্ষতিকর ভাইরাসজনিত রোগ। এ রোগে আক্রান্ত গাভীর দুধ তেমন একটা হ্রাস পায় না। তবে বাটের ক্ষত কাঁচা থাকা অবস্থায় বেদনার কারণে অনেক সময় দুধ দোহনে বাধা দেয়। এ রোগের কারণে দুধ খাওয়ার অনুপযোগী হয় না। এ বসন্তের জটিলতা হিসেবে ওলানপ্রদাহ দেখা দিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে দুধ উৎপাদন ব্যহত হয়।

অনুশীলন (Activity) *ঃ গরু ও মহিষের বসন্ত নিয়ন্ত্রণের জন্য আপনি কী কী পন্থা অবলম্বন করবেন?*

ছাগল ও ভেড়ার বসন্ত রোগ (Goat and Sheep Pox)

ছাগল ও ভেড়ার বসন্ত একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এ রোগের ফলে ছাগল ও ভেড়ার ত্বকের মধ্যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

ছাগল ও ভেড়ার বসন্ত রোগ একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এ রোগের ফলে ছাগল ও ভেড়ার ত্বকের মধ্যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এশিয়া, আফ্রিকা এবং উত্তর-পূর্ব ইউরোপের ছাগল ও ভেড়ায় এ রোগ বেশি দেখা দেয়। ছাগলের বসন্ত রোগের সুপ্তিকাল (Incubation Period) হলো ৫–১৪ দিন এবং ভেড়ার মধ্যে এ রোগের সুপ্তিকাল ৪–৮ দিন। উভয় প্রকার পশুতে এ রোগের লক্ষণ একই। এ রোগ মড়ক আকারে দেখা দেয়।

রোগের কারণ

Goat Pox Virus এবং Sheep Pox Virus যথাক্রমে ছাগল ও ভেড়ার বসন্ত রোগের একমাত্র কারণ।

সংক্রমণ

স্পর্শ, বাতাস ও কীটপতঙ্গের মাধ্যমে ছাগল ও ভেড়ার বসন্ত ছড়ায়।

- বাতাসের মাধ্যমে এ রোগের জীবাণু একস্থান হতে অন্যস্থানে ছড়ায় এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের ফলেও সংক্রমিত হয়।
- সুস্থ পশু অসুস্থ পশুর সংস্পর্শে আসলে সংক্রমিত হয়।
- কীট-পতঙ্গের মাধ্যমেও এ রোগের জীবাণু অসুস্থ পশু থেকে সুস্থ পশুতে ছড়ায়।

চিত্র ২৬ ঃ ভেড়ার মুখমন্ডলে বসন্তের ক্ষত

চিত্র ২৭ ঃ ভেড়ার দেহে বসন্তে র ক্ষত

রোগের লক্ষণ

- জ্বর এবং বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়।
- চোখের পাতা ফুলে যায় এবং নাক দিয়ে পানি ঝরে।
- দেহের বিভিন্ন লোমবিহীন স্থানে, বিশেষ করে চোয়াল, কান, ওলান, লেজের নিচে, লালচে গুটি দেখা যায়।
- নাকের বর্হিভাগে, মুখ গহ্বরে ক্ষত দেখা দেয়।
- চামড়ার উপরের অংশ উঠে যায় এবং শক্ত স্ক্যাব (Scab) সৃষ্টি হয়।

রোগ নির্ণয়

- রোগের লক্ষণ দেখে।
- আক্রান্ত পশুর চামড়ার গুটি থেকে নমুনা সংগ্রহ করে Direct Flourescent Antibody Test এর মাধ্যমে ভাইরাস শণাক্ত করা যায়।

প্রতিরোধ

লাইভ এবং ইনঅ্যাকটিভেটেড বসন্ত টিকাবীজ ছাগল ও ভেড়ায় সুস্থ অবস্থায় প্রয়োগ করলে এ রোগ হয় না।

- টিকাবীজ প্রয়োগে– লাইভ এবং ইনঅ্যাকটিভেটেড বসন্ত টিকাবীজ ছাগল ও ভেড়ায় সুস্থ অবস্থায় প্রয়োগ করলে এ রোগ হয় না। তবে লাইভ টিকাবীজ ইনঅ্যাকটিভেটেড টিকাবীজের চেয়ে অধিক ফলপ্রসু। তাই লাইভ টিকাবীজ ব্যবহার করাই শ্রেয়।
- যেসব উপায়ে এ রোগ সংক্রমণ হয়ে থাকে সেসব উৎস প্রতিহত করলে এ রোগ না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- আক্রান্ত পশুকে সম্পর্ণ পৃথকীকরণ বা সঙ্গনিরোধ করা (Quarantine)।
- এ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া পশুকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে।

চিকিৎসা

যেহেতু বসন্ত ভাইরাসজনিত রোগ তাই এর কোনো সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই।

- যেহেতু বসন্ত একটি ভাইরাসজনিত রোগ সেহেতু এর কোনো সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। তবে মাধ্যমিক ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ রোধ করার জন্য যে কোনো উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- চামড়ার ক্ষত স্থানে যে কোনো সালফানিলামাইড মলম ব্যবহার করা যেতে পারে।

অনুশীলন (Activity) ঃ *গরুমহিষ এবং ছাগলভেড়ার বসন্তের প্রধান প্রধান পার্থক্যগুলো লিপিবদ্ধ করুন।*

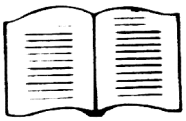

সারমর্ম ঃ গরু ও মহিষের বসন্ত একটি মৃদু প্রকৃতির ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ। এ রোগে প্রধানত দুগ্ধবতী গাভী আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত গাভীর ওলান ও বাটে বসন্তের গুটি দেখা যায়। দোহনকারীর হাত ও দোহন যন্ত্রের মাধ্যমে এ রোগ অন্যান্য পশুতে ছড়িয়ে পড়ে। রোগলক্ষণ পর্যবেক্ষণ ও গবেষণাগারে নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে গরু ও মহিষের বসন্ত নিরূপন করা হয়। এ রোগের কোনো কার্যকর চিকিৎসা নেই। এ বসন্ত প্রতিরোধ করার কোনো ফলপ্রসু টিকাও এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। তবে এ রোগ থেকে নিরাময়প্রাপ্ত গাভী পরবর্তী কয়েক বছরের জন্য রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা লাভ করে। কিন্তু, ছাগল ও ভেড়ার বসন্ত একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এ রোগে ছাগল ও ভেড়ার লোমবিহীন স্থান, যেমন– চোয়াল, কান, ওলান ও লেজের নিচে লালচে গুটি দেখা যায়। গরু ও মহিষের বসন্তের মতোই এ রোগ শণাক্ত করা যায়। এ রোগ প্রতিরোধের জন্য দুধরণের ফলপ্রসু টিকা রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.২

১। সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. গরু ও মহিষের বসন্তের জীবাণু পশুর শরীরে কতদিন পর্যন্ত সুপ্তাবস্থায় থাকে?
- i) ৭ দিন
- ii) ১৫ দিন
- iii) ২৯ দিন
- iv) ৪১ দিন

খ. দোহনকারীর শরীরের কোথায় এ রোগের লক্ষণ দেখা যায়?
- i) পিঠে
- ii) মাথায়
- iii) হাতে
- iv) নিতম্বে

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. গরু ও মহিষের বসন্ত হলে শরীরের তাপমাত্রা অত্যধিক বেড়ে যায়।

খ. বসন্ত রোগে আক্রান্ত পশু দুধ দোহনে বাধা দেয় না।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. দোহনকারীর থথথথথথ মাধ্যমে গরু ও মহিষের বসন্ত সংক্রমিত হয়।

খ. বসন্ত রোগের বিরুদ্ধে কোনো ফলপ্রসু থথথথথ নেই।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. ষাঁড়ের শরীরের কোথায় বসন্ত রোগের লক্ষণ দেখা যায়?

খ. মুরগির ভ্রূণে বসন্ত রোগ কী চিহ্ন তৈরি করে?

পাঠ ২.৩ জলাতঙ্ক

এ পাঠ শেষে আপনি –

- জলাতঙ্ক কী তা বলতে পরবেন এবং এ রোগের বিস্তৃতি ও কারণ আলোচনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন পশুতে কীভাবে জলাতঙ্ক রোগ সংক্রমিত হয় ও বিকাশলাভ করে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত পশুর লক্ষণ ও মৃত্যুর কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- এ রোগ নির্ণয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি ও পরিণতি সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- জলাতঙ্ক রোগ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন কৌশল ও পন্থা বর্ণনা করতে পারবেন।

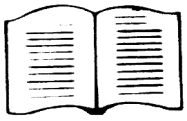

জলাতঙ্ক একটি মারাত্মক ভাইরাসজনিত রোগ। মানুষসহ সকল উষ্ণ রক্তবাহী পশু এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

জলাতঙ্ক কী?

জলাতঙ্ক (Rabies) একটি মারাত্মক ভাইরাসজনিত রোগ। মানুষসহ সকল উষ্ণ রক্তবাহী (Warm Blooded) পশু এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তবে, প্রাকৃতিক পরিবেশে কুকুর, বিড়াল, শৃগাল, গরু, মাংসাশি বন্যপ্রাণী, বাদুড় প্রধানত বেশি আক্রান্ত হয়। পাগলা কুকুরের দংশনে সৃষ্ট এ রোগে পশুর কেন্দ্রী স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয়। পশু উন্মাদ ও আক্রমণাত্মক হয় এবং পরবর্তীতে উর্ধমুখী অবশতা বা প্যারালাইসিস (Paralysis) দেখা দেয়। এ রোগে অন্ননালির উপরে অবস্থিত গহ্বর অর্থাৎ গলবিল বা ফ্যারিংসের (Pharynx) পেশির শিথিলতার কারণে পানি গ্রহণ করতে পারে না। এমতাবস্থায়, আক্রান্ত পশু পানি দেখলে ভয় পায় বলে এ রোগের নাম দেয়া হয়েছে জলাতঙ্ক বা হাইড্রোফোবিয়া (Hydrophobia)।

রোগের বিস্তৃতি

জলাতঙ্ক পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই পাওয়া যায়। তবে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে এ রোগের প্রাদুর্ভাব নেই বললেই চলে।

রোগের কারণ

রেবিস নামক এক প্রকার ভাইরাস এ রোগ সৃষ্টি করে। এ ভাইরাস বুলেট আকৃতির। এর দুটো প্রধান টাইপ রয়েছে। যথা– স্ট্রিট ভাইরাস ও ফিক্সড ভাইরাস। স্ট্রিট ভাইরাস প্রাকৃতিক পরিবেশে রোগের সৃষ্টি করে। এ ভাইরাস খুবই বিপদজনক। পক্ষান্তরে, ফিক্সভ ভাইরাস গবেষণাগারে তৈরি করা হয়। স্ট্রিট ভাইরাস পুনঃপুনঃ মুরগির ভ্রূণের মধ্যে বংশবৃদ্ধির ফলে ফিক্সড ভাইরাসে পরিণত হয়। এ ভাইরাসের রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা কম বলে প্রতিষেধক বা টিকা তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।

রেবিস নামক এক প্রকার ভাইরাস জলাতঙ্ক সৃষ্টি করে। এ ভাইরাস বুলেট আকৃতির।

সংক্রমণ

আমাদের দেশে প্রধানত পাগলা কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক রোগ বিস্তারলাভ করে।

আক্রান্ত অথবা ভাইরাস বহনকারী পশু অন্য কোনো পশুকে কামড় দিলে যে ক্ষত সৃষ্টি হয় সে ক্ষতস্থানে সদ্য নির্গত লালার মাধ্যমে ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করে। আমাদের দেশে প্রধানত পাগলা কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক রোগ বিস্তারলাভ করে। বাদুড় এ রোগের জীবাণু বহন করে এবং কোনো পশুকে কামড়ালে সে পশু জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হতে পারে। বাদুড়ে এ ভাইরাস কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র আক্রমণ না করে হেজাতীয় কলাতে বংশবিস্তার করতে পারে। এ অবস্থায় বাদুড় কোনো লক্ষণ প্রকাশ না করেই শরীরে ভাইরাস বহন করে এবং অন্য কোনো পশুকে কামড় দিলে সহজেই এ রোগ সংক্রমিত হয়। বন্যপ্রানীর মধ্যে নেকড়ে, হায়েনা, বানর, বেজি, কাঠবিড়ালী প্রভৃতির মাধ্যমেও এ রোগের বিস্তার ঘটে। শ্বাসনালি ও পৌষ্টিকনালির মাধ্যমে এ রোগ ছড়াতে পারে।

গ্রীষ্মের শেষে এবং শরৎকালে জলাতঙ্ক রোগের প্রকোপ বেশি।

গ্রীষ্মের শেষে এবং শরৎকালে জলাতঙ্ক রোগের প্রকোপ বেশি। কারণ, এ সময় কুকুরসহ বন্যপ্রাণীরা প্রজননের উদ্দেশ্যে তৎপর থাকে বিধায় এদের আচরণ অত্যন্ত ক্ষীপ্ত ও হিংস্র হয়। গবাদিপশু থেকে জলাতঙ্ক রোগের বিস্তার কদাচিৎ ঘটে। তবে নগ্ন ক্ষতযুক্ত হাত দ্বারা আক্রান্ত পশুর মুখ পরীক্ষাকালে ক্ষতস্থান লালার সংস্পর্শে আসলে এ রোগ সংক্রমিত হতে পারে।

রোগের বিকাশ

ভাইরাস বহনকারী লালা ক্ষতস্থানে অবস্থিত স্নায়ুর সংস্পর্শে আসে এবং এর মাধ্যমে ভাইরাস কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পৌঁছে। গবেষণার মাধ্যমে দেখা গেছে, ক্ষতস্থান থেকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে মেরুরজ্জুতে পৌঁছে এবং ৪–৫ দিনের মধ্যে এর কলাতে সংক্রমিত হয়। মেরুরজ্জুতে পৌঁছার পর ভাইরাস উর্ধমুখে যাত্রা করে মস্তিষ্কে পৌঁছে। এখান থেকে স্নায়ুর মাধ্যমে ভাইরাস লালাগ্রন্থিতে প্রবেশ করে।

রোগের লক্ষণ

লক্ষণ অনুযায়ী জলাতঙ্ক প্রধানত দুই প্রকারের হয়ে থাকে। যথা– শিথিল রূপ ও উত্তেজিত রূপ।

গবাদিপশুর মধ্যে গরুই সর্বাপেক্ষা বেশি আক্রান্ত হয়। জলাতঙ্কে আক্রান্ত প্রাণী কামড়ানোর পর গরুতে সাধারণত ৩ সপ্তাহের মধ্যে রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। তবে অধিকাংশ প্রজাতির পশুতে লক্ষণ প্রকাশের জন্য ২ সপ্তাহ থেকে কয়েকমাস পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। সকল প্রজাতির পশুই সাধারণত একই প্রকার লক্ষণ প্রদর্শন করে। এ রোগে আক্রান্ত পশুর আচরণে লক্ষণীয় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত লক্ষণ প্রকাশের প্রথম দিকে উত্তেজনা ও পরে শিথিলতা দেখা দেয়। শারীরিক তাপমাত্রার কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় না। মুখ থেকে লালা নির্গত হয়, ঘন ঘন প্রস্রাব করে এবং পুরুষ পশুতে সাময়িকভাবে অতিরিক্ত যৌনানুভূতি দেখা দেয়। লক্ষণ অনুযায়ী জলাতঙ্ক প্রধানত দুই প্রকারের হয়ে থাকে। যথা– শিথিল রূপ ও উত্তেজিত রূপ।

চিত্র ২৮ ঃ জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত একটি গরু

শিথিল প্রকৃতির জলাতঙ্কে গলা এবং চাবানোর জন্য ব্যবহৃত পেশি অবশ হয়ে যায়।

শিথিল রূপ (Paralytic Form) ঃ এ প্রকৃতির জলাতঙ্কে গলা এবং চাবানোর জন্য ব্যবহৃত পেশি অবশ হয়ে যায়। মুখ থেকে প্রচুর লালা নির্গত হয় ও গলধকরণ ক্ষমতা লোপ পায়। কুকুরের নিচের

চোয়াল ঝুলে পড়ে এবং কদাচিৎ দংশন করে। পরবর্তীতে সারা শরীর অবশ হয়ে যায় এবং কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মৃত্যু ঘটে।

গরু হাঁটার সময় পিছনের পায়ের স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়ে যায়, লেজ নিশ্চল হয়ে পড়ে এবং ডান অথবা বামে স্থানচ্যুত হয়। পিছনের পায়ের অনুভূতি কমে যায় এবং দুর্বলতার কারণে হঠাৎ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে পারে। মুখ থেকে সুতাকৃতির লালা নির্গত হয় এবং মটিতে লুটিয়ে পড়ার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে এবং লক্ষণ দেখা দেয়ার ৬–৭ দিনের মধ্যে গরু মারা যায়।

উত্তেজিত ধরনের জলাতঙ্কে আক্রান্ত প্রাণী কান্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে এবং অত্যন্ত উত্তেজিত ও আক্রমণাত্নক হয়।

উত্তেজিত রূপ (Furious Form) ঃ এ ধরনের জলাতঙ্কে আক্রান্ত প্রাণী কান্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে এবং অত্যন্ত উত্তেজিত ও আক্রমণাত্নক হয়। এসব পশুর চক্ষুতারা প্রসারিত হয় এবং সকল প্রকার ভয়ভীতি লোপ পায়। এ অবস্থায় কোনো অবসতার লক্ষণ দেখা যায় না। আক্রান্ত কুকুর লক্ষণ প্রকাশের পর সাধারণত ১০ দিনের বেশি বাঁচে না। তবে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রাস্তাঘাটে মানুষ, গরু, অন্যান্য পশু এমনকী চলন্ত বস্তুকে দংশন করে। এ পর্যায়ে আক্রান্ত পশু বিষ্ঠা, খড়, লাঠি, পাথর ইত্যাদি অখাদ্য বস্তু খাওয়ার চেষ্টা করে। এ রোগের আরও বিকাশলাভের সাথে সাথে পেশির সমন্বয়হীনতা এবং খিঁচুনি পরিলক্ষিত হয়। অবশেষে সারা শরীর অবশ হয়ে পড়ে এবং পশু মারা যায়।

গরুর ক্ষেত্রেও অনেকটা একই ধরনের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। আক্রান্ত পশু অতিরিক্ত সতর্ক হয়, শব্দ ও নড়াচড়াতে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখায়। কখনও কখনও অন্য পশু বা কোনো বস্তুকে আক্রমণ করে এবং উচ্চস্বরে হাম্বা হাম্বা করে। আক্রান্ত ষাঁড় অতিরিক্ত যৌনানুভূতির কারণে অন্য পশু অথবা অপ্রাণী বস্তুর উপর ঝাপিয়ে পড়ে। এ ধরনের লক্ষণ প্রদর্শনের ২৪-৪৮ ঘন্টার মধ্যে অবশতার কারণে পশু হঠাৎ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং কয়েক ঘন্টার মধ্যে মারা যায়।

কেন্দ্রীয়স্নায়ুতন্ত্র থেকে দংশন স্থানের দূরত্বের তারতম্যের কারণে রোগলক্ষণ প্রকাশের সময় প্রভাবিত হয়।

মানুষের ক্ষেত্রে পাগলা কুকুরে দংশনের ৩০–৬০ দিনের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তবে দংশনের পর সর্বনিু ২ সপ্তাহ এবং সর্বোচ্চ ২ বৎসর পরও এ রোগের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। কেন্দ্রীয়স্নায়ুতন্ত থেকে দংশন স্থানের দূরত্বের তারতম্যের কারণে রোগলক্ষণ প্রকাশের সময় প্রভাবিত হয়। আক্রান্ত স্থান মাথার নিকট হলে রোগলক্ষণ তাড়াতাড়ি প্রকাশ পায়। আবার পিছনের পায়ের নিচের অংশ দংশিত হলে রোগলক্ষণ দেখা দিতে বিলম্ব হয়। জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত মানুষে প্রথমে মাথা ব্যাথা, ক্ষুধামন্দা ও বমিভাব পরিলক্ষিত হয়। গলা শুকিয়ে আসে, অতিরিক্ত তৃষ্ণা অনুভূত হয় অথচ পানি পানে অনিহা দেখা দেয়। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে উত্তেজনা ও শারীরিক অবশতা দেখা দেয় এবং এরূপ লক্ষণ দেখা দেয়ার ২–৬ দিনের মধ্যে রুগি মারা যায়।

মৃত্যুর কারণ

দংশনের পর ভাইরাস স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে যতই উর্ধমুখে উঠতে থাকে ততই স্নায়ুকোষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ফলশ্রুতিতে শরীরে অবশতা পরিলক্ষিত হয়। এ জীবাণুর আক্রমণ মস্তিষ্কে পৌঁছলে উন্মাদনা, উত্তেজনা, ক্ষিপ্রতা ও খিঁচুনি দেখা দেয়। মস্তিষ্কে শ্বসন কাজের জন্য নির্ধারিত স্নায়ুকোষসমূহ ধ্বংস হলে শ্বসনকার্য বন্ধ হয়ে পশু মারা যায়।

রোগ নির্ণয়

জলাতঙ্ক রোগ নির্ণয় করা বেশ কঠিন এবং বিপদসংকুল। কেননা এ রোগ মানুষে সংক্রমিত হতে পারে। আক্রান্ত পশুর লক্ষণ দেখে সাধারণত রোগ নির্ণয় করা হয়। তবে মালিক অথবা পালক কর্তৃক পাগলা কুকুরে দংশনের অভিযোগ থাকলে এ রোগ সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিত হওয়া যায়। দংশনকারী কুকুরবিড়ালকে ১০ দিন পর্যন্ত আটক রাখা হলে যদি জলাতঙ্কের লক্ষণ দেখা দেয় তাহলে উক্ত প্রাণী

জলাতঙ্ক রোগ নির্ণয় করা বেশ কঠিন এবং বিপদসংকুল। কেননা এ রোগ মানুষে সংক্রমিত হতে পারে।

আক্রান্ত পশুর লক্ষণ দেখে সাধারণত রোগ নির্ণয় করা

মেরে তার মস্তিষ্ক গবেষণাগারে পরীক্ষা করে এ রোগের উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়। ফ্লোরোসেন্ট অ্যান্টিবডি স্টেইনিং টেকনিক (Fluorescent Antibody Staining Technique) এর মাধ্যমে কয়েক ঘন্টার মধ্যে এ রোগ নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা যায়। এক্ষেত্রে মৃত পশুর মস্তিষ্কের হিপোক্যাম্পাস (Hippocampus) অথবা মেডুলা অবল্যাংগাটা থেকে ইমপ্রেশন (Medulla Oblangata) স্মিয়ার (Impression Smear) তৈরি করা হয়।

জলাতঙ্কের লক্ষণ একবার দেখা দিলে অবধারিত পরিনতি মৃত্যু।

রোগের পরিণতি

জলাতঙ্ক একটি মারাত্মক জীবনহরণকারী রোগ। এ রোগের লক্ষণ একবার দেখা দিলে অবধারিত পরিনতি মৃত্যু।

জলাতঙ্ক ভাইরাসজনিত রোগ হওয়ায় এর কোনো কার্যকর চিকিৎসা নেই।

চিকিৎসা

জলাতঙ্ক ভাইরাসজনিত রোগ হওয়ায় এর কোনো কার্যকর চিকিৎসা নেই। তবে দংশনের পরপরই ক্ষতস্থান ২০% কোমল সাবান পানি দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করলে উপকার পাওয়া যায়। রোগের লক্ষণ দেখা দেয়ার পর টিকার কোনো কার্যকারিতা থাকে না। তবে জলাতঙ্ক আক্রান্ত কুকুর কোনো পশুকে দংশন করলে অনতিবিলম্বে এ রোগের প্রতিষেধক ব্যবহার করে জীবন রক্ষা করা যায়।

রোগ নিয়ন্ত্রণ

রাস্তাঘাটের যাবতীয় বেওয়ারিশ কুকুরবিড়াল মেরে ফেলতে হবে। সকল পোষা কুকুরবিড়ালকে যথারীতি প্রতিষেধক দিতে হবে। বনেজঙ্গলে অবস্থানরত সংক্রমণকারী প্রাণী, যেমন– নেকড়ে, হায়েনা, বানর, শিয়াল, বেজি, কাঠবিড়ালী যথাসম্ভব মেরে ফেলতে হবে। ইউরোপে বন্যপ্রাণীর মধ্যে শিয়াল ৮৫% রোগ সংক্রমিত করে। আমাদের দেশেও এ রোগ বিস্তারে কুকুরের পরেই শিয়ালের স্থান। কাজেই এ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য শিয়াল নিধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা একটা দুরূহ কাজ বিধায় এ রোগের সম্পর্ণ নিয়ন্ত্রণ অনেকটা অসম্ভব।

এদেশে জলাতঙ্ক নিয়ন্ত্রণ করতে অবিলম্বে বিদেশ থেকে আগত কুকুরবিড়ালের জন্য কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন।

জলাতঙ্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য অবিলম্বে বিদেশ থেকে আগত কুকুরবিড়ালের জন্য কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। এ ব্যবস্থায়, বিদেশ থেকে আসা সকল কুকুরবিড়ালকে ৩–৬ মাস পর্যন্ত পৃথকভাবে রাখা হয়। এ সময়ের মধ্যে জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণ না দেখা দিলে ঐসব পশুকে দেশের অভ্যন্তরে নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়। দ্বীপরাষ্ট্রের জন্য কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা কার্যকর। কিন্তু যেসব দেশের মধ্যে সাধারণ স্থলসীমা বিদ্যমান সেসব দেশে এ ব্যবস্থা রোগ নিয়ন্ত্রণে তেমন ভূমিকা রাখে না। টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে এ রোগের বিস্তার সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বাংলাদেশে জলাতঙ্ক রোগের জন্য দুপ্রকার টিকা বা ভ্যাকসিন রয়েছে। লেপ (LEP = Low Embryo Passage) টিকা কুকুরে ও হেপ (HEP = High Embryo Passage) টিকা গবাদিপশুতে প্রয়োগ করা হয়। এসব টিকা প্রয়োগ করলে পশু এক বৎসর পর্যন্ত জলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধ করতে পারে।

টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে জলাতঙ্কের বিস্তার সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

অনুশীলন (Activity) ঃ *জলাতঙ্ক রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য আপনি কী কী কৌশল গ্রহণ করবেন তা খাতায় লিখুন।*

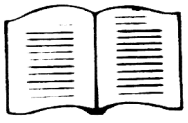

সারমর্ম ঃ জলাতঙ্ক একটি মারাত্মক ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ। এ রোগের লক্ষণ একবার প্রকাশ পেলে মৃত্যু অবধারিত। মানুষসহ সকল উষ্ণ রক্তবাহী পশু জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগ প্রধানত পাগলা কুকুরশিয়ালের দংশনে সংক্রমিত হয়। আক্রান্ত পশু প্রথমে উত্তেজিত ও আক্রমণাত্মক হয়। পরবর্তীতে উর্ধমুখী প্যারালাইসিসের কারণে পশু নিশ্চল হয়ে পড়ে এবং এক পর্যায়ে মৃত্যুবরণ করে। পাগলা কুকুরে কামড়ানোর অভিযোগ ও আক্রান্ত পশুর লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে এ

রোগ নির্ণয় করা যায়। লক্ষণ প্রকাশের পর এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। তবে কুকুরে কামড়ানোর পরপরই অ্যান্টির‍্যাবিস ভ্যাকসিন প্রয়োগের মাধ্যমে জলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধ করা যায়। রাস্তাঘাটের কুকুরশিয়াল নিধন ও নিয়মিত টিকা প্রদানের মাধ্যমে এ রোগের বিস্তার অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৩

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. জলাতঙ্ক ভাইরাস শরীরে প্রবেশের পর কোন্ বিশেষ অংশে আক্রমণ করে?

i) মাংশপেশি
ii) অন্ডকোষথলি
iii) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র
iv) ফুসফুস

খ. জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত পশুর পরিণতি কী হয়?

i) পাগল হয়
ii) দীর্ঘজীবী হয়
iii) আরোগ্য লাভ করে
iv) অবধারিত মৃত্যু

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. বিড়াল জলাতঙ্ক বিস্তারে প্রধান ভূমিকা পালন করে।
খ. জলাতঙ্ক রোগে নিম্নমুখী প্যারালাইসিস দেখা দেয়।

৩। শূণ্যস্থান পূরণ করুন।

ক. থথথথ ব্যবহার করে জলাতঙ্ক রোগের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
খ. গবেষণাগারে তড়িৎ রোগ নির্ণয় পদ্ধতির নাম থথথথথথথথ অ্যান্টিবডি স্টেইনিং টেকনিক।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. জলাতঙ্ক ভাইরাসের প্রধান দুটো টাইপের নাম কী?
খ. জলাতঙ্ক রোগের প্রধান দুটো রূপের নাম কী?

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ২

সংক্ষিপ্ত ও রচনাম লক প্রশ্ন

১। ক্ষুরারোগ কী?
২। ক্ষুরারোগ গরুতে কীভাবে বিকাশলাভ করে?
৩। আক্রান্ত গরুর ক্ষুরারোগ কীভাবে নির্ণয় করা হয়?
৪। ক্ষুরারোগের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহ লিখুন।
৫। ক্ষুরারোগের কারণে কৃষক কীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হন?
৬। গরু ও মহিষের বসন্ত রোগের বৈশিষ্ট্য কী?
৭। গরু ও মহিষের বসন্ত কীভাবে পশুতে সংক্রমিত হয়?
৮। ছাগল ও ভেড়ার বসন্তের লক্ষণসমূহ বর্ণনা করুন।
৯। কীভাবে ছাগল ও ভেড়ার বসন্ত রোগের চিকিৎসা করবেন?
১০। জলাতঙ্ক নামকরণের ভিত্তি কী?
১১। জলাতঙ্ক রোগের কারণ বর্ণনা করুন।
১২। জলাতঙ্কের শিথিল ও উত্তেজিত রূপের বৈশিষ্ট্য লিখুন।
১৩। জলাতঙ্কের ফলে কীভাবে পশুর মৃত্যু হয়?
১৪। কীভাবে জলাতঙ্ক রোগ নির্ণয় করা হয়?
১৫। জলাতঙ্ক রোগ নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তরমালা – ইউনিট ২

পাঠ ২.১

১। ক. রর ১। খ. ররর ২। ক. স ২। খ. স ৩। ক. ফুট ৩। খ. চার
৪। ক. দুই ক্ষুরের মধ্যবর্তী স্থান এবং ক্ষুর-ত্বকের সন্ধিস্থলে ৪। খ. গলকম্বলের ত্বকের নিচে

পাঠ ২.২

১। ক. র ১। খ. ররর ২। ক. মি ২। খ. মি ৩। ক. হাতের ৩। খ. টিকা
৪। ক. অন্ডকোষথলির ত্বকে ৪। ক. পক লিশন (Pock Lesion)

পাঠ ২.৩

১। ক. ররর ১। খ. রা ২। ক. মি ২। ক. মি ৩। ক. টিকা ৩। খ. ফ্লোরেসেন্ট
৪। ক. স্ট্রিট ও ফিক্সড ৪। খ. শিথিল ও উত্তেজিত